Dhrubapad – Prabandho - Cinema – Boi Theke Chabi – Pather Pachalir Uttaradikar – Sugata Singo

ধ্রুবপদ - বই থেকে ছবি - পথের পাঁচালীর উত্তরাধিকার - সুগত সিংহ

নানারকম দুর্বিপাক, মালিন্য এবং উৎকণ্ঠার মধ্যে বাঙালির মানস - জীবন যে কটি ঘটনা হঠাৎ পাওয়া উপহারের মতো এসেছে তার মধ্যে অন্যতম হল বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথের পাঁচালী এবং সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী'। হঠাৎ পাওয়া এই কারণে বলছি পথের পাঁচালী বিভূতিভূষণের প্রথম উপন্যাস এবং সত্যজিত্যের প্রথম ছবি। এর যেন কোনও প্রস্তুতি ছিল না বা থাকলেও আমাদের জানা ছিল না। দুটি সৃষ্টিই আমাদের দেখার ক্ষমতাকে কোনও না কোনও ভাবে বিস্তৃত করেছে, এনলাইটেনও করেছে। উপন্যাসটি নিয়ে আমাদের অভিভূত হয়ে যাওয়ার আরেকটি কারণ তা পাঠককে কোনও প্রশ্নের সামনে দাঁড় করায় না, অস্বস্তিকে ফেলে না। বরং বোঝায় বাঙালি জীবনের শেকড়ে-বাকড়ে, লতায় - পাতায়, ছাল - বাকলে যে-রস জমা হয়ে আছে তা তুচ্ছ হলেও মহান, দরিদ্র হলেও সুন্দর। ফলত পাঠক বেশ স্বস্তি পায়, কিছু নেই তবু আমরা অনেক কিছু এমন একটা আত্মসম্মান বোধ জেগে ওঠে। উপন্যাসে দারিদ্র্যের ডকুমেন্টেশন আছে এবং একটা জনগোষ্ঠি কীভাবে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর যুগের পর যুগ দারিদ্র্যকে মানিয়ে নিচ্ছে তৃতীয় বিশ্বের সেই মানসিকতা ধরা আছে। এই উপাদানগুলি উপন্যাস থেকে চলচ্চিত্রেও সঞ্চারিত হয়েছে। পুডোভকিনের 'মাদার' কিংবা কুরোসাওয়ার 'ম্যাকবেথ' -এর মতো কয়েকটি দৃষ্টান্ত বাদ দিলে সার্থক সাহিত্যের সার্থক চলচ্চিত্রে রূপান্তরের উদাহরণ সারা পৃথিবী জুড়েই দুর্লভ। আমাদের হাতের কাছে যখন এরকম একটি সুযোগ রয়েছে, আজ যখন উপন্যাসটির পঁচাত্তর বছর এবং সিনেমাটির পঞ্চাশ বছর হয়ে গেল, যখন একটু দর থেকে দুটি সৃষ্টিকর্মকেই যাচাই করা যাচ্ছে তখন উপন্যাসের কোন কোন অংশ ছবিতে বাদ গেছে, পরিবর্তিত হয়েছে এবং কেন এসব করা হয়েছে তা খতিতে দেখা যেতে পারে।

বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালী পড়তে গেলে দেখা যায় বিভিন্ন চরিত্রের তিনি বিশাল বিশাল পশ্চাৎপট তৈরি করেছেন। যেমন হরিহর কোথা থেকে এল ? হরিহরের পূর্বপুরুষ বিষ্ণুরাম রায়, তার পুত্র বীরু রায়ের অধীনে ছিল এক বিরাট ঠ্যাঙাড়ে দল, হরিহরের বাবা রামচাঁদ রায়ের দুটি বিয়ে, দ্বিতীয় পক্ষে হরিহরের জন্ম, রামচাঁদের অকর্মণ্যতা, শ্বশুরবাড়িতে বউ - বাচ্চাকে ফেলে পরগাছার মতো তাস-পাশা খেলে বেড়ান ইত্যাদি। আাবার ইন্দির ঠাকরুণ সম্পর্কে বলা আছে কোন এক সময় কুলিন ঘরে তার বিয়ে হয়েছিল, তার একটি মেয়েও ছিল বিশ্বেশ্বরী। বিয়ের পর পরই রামচাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বালিকা সর্বজয়াকে শ্বশুরবাড়িতে ফেলে রেখে হরিহর বিবাগী হয়ে গিয়েছিল। তারপর কম দিন! আট বছর পরে সে যখন ফিরে এল সর্বজয়া তখন যুবতী, হরিহর চমকে উঠেছিল, দুজনের মধে ঘনিয়ে উঠেছিল রোমান্স। বিভিন্ন চরিত্রের এই যে নানারকম ব্যাকগ্রাউণ্ড তা ছবিতে বাদ গেছে। সিনেমাতে একবারশুধু হরিহরকে সর্বজয়া কথা শোনায়, 'আট বছর আমাকে বাপের বাড়ি ফেলে চলে গেসলে তুমি, চিঠি পর্যন্ত লেখোনি।' আসলে সত্যজিতের পরের ছবিগুলি দেখলে বোঝা যায় সিনেমাটিক টুল হিসেবে ফ্ল্যাশব্যাক ব্যবহার করাটা তিনি পারতপক্ষে এড়িয়ে চলতেন। 'দেবী', 'নায়ক', 'অরণ্যের দিনরাত্রি'-র মতো ছবিতে ক্বচিৎ কদাচিৎ ফ্ল্যাশব্যাকগুলি দেখাতে গেলে সমস্যা ছিল অনেক। প্রথমত, প্রভূত খরচা বাড়ত। দ্বিতীয়ত, অল্পবয়সী সর্বজয়া হরিহরের জন্য অন্য অভিনেতা অভিনেত্রী বাছতে হত, সেটা বিশ্বাসযোগ্য হত কি না সন্দেহ। অথবা মেক-আপের সাহায্য নিতে হত। মেক - আপ আরেকটি সিনেমাটিক টুল যা 'পথের পাঁচালী'-তে সচেতনভাবে বর্জিত হয়েছিল। সার্বিকভাবে বলা যায় মুহুর্মুহু ফ্ল্যাশব্যাক এলে ছবিটি গঠনের দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হত। কিন্তু এর ফলে উপন্যাসটির একটি মাত্রা ছবিতে হারিয়ে গেছে। বিভূতিভূষণ এক একটি আঁচড়ে, এক একটি প্যারাগ্রাফে চরিত্রগুলির যে পশ্চাৎপট এঁকেছেন, তার মধ্যে তৎকালীন বাঙালী জীবনের খণ্ড খণ্ডসামাজিক ইতিহাস ধরা পড়েছে। একটি উদাহরণ)

> বৃটিশ শাসন তখনও দেশে বদ্ধমূল হয় নাই। যাতায়াতের পথ সকল ঘোর বিপদসংকুল ও ঠগী, ঠ্যাঙড়ে, জলদস্যু প্রভৃতিতে পূর্ণ থাকিত। এই ডাকাতের দল প্রায়ই গোয়ালা, বাগ্‌দী, বাউরী শ্রেণীর লোক। তাহারা অত্যন্ত বলবান, লাঠি এবং সড়কী চালানোতে সুনিপুণ ছিল। বহু গ্রামের নিভৃত প্রান্তে ইহাদের স্থাপিত ডাকাতে কালীর মন্দিরের চিহ্ন এখনও বর্তমান আছে। দিনমানে ইহারা ভালমানুষ সাজিয়া বেড়াইত, রাত্রে কালীপূজা দিয়া দূর পল্লীতে গৃহস্থ - বাড়ী লুঠ করিতে বাহির হইত। তখনকার কালে অনেক সমৃদ্ধিশালী গৃহস্থও ডাকাতি করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিতেন। বাংলা দেশে বহু জমিদার ও অবস্থাপন্ন গৃহস্থের অর্থের মূলভিত্তি যে এই পূর্বপুরুষ সঞ্চিত লুণ্ঠিত ধনরত্ন, যাঁহারাই প্রাচীন বাংলার কথা জানেন, তাঁহারা ইহাও জানেন। বিষ্ণুরাম রায়ের পুত্র বীরু রায়ের এইরূপ অখ্যাতি ছিল। তাঁহার অধীনে বেতনভোগী ঠ্যাঙাড়েথাকিত।
>
> (পথের পাঁচালী-দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)

অর্থাৎ দিনের আলোয় যতই জাতপাতের ধমক থাক রাতের অন্ধকারের সেসব ঘুচে যেত। পেটের দায়ে হোক বা লোভের বশে হোক, বীরু রায়ের মতো নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণরা নিচু জাতের লেঠেলদের সঙ্গে মিলে দস্যুবৃত্তি করে বেড়াত। দ্বিতীয় উদাহরণটি তুলে দিচ্ছি ইন্দির ঠাকরুণ সম্পর্কে)

> শোনা যায় পূর্বদেশীয় এক নামজাদা কুলীনের সঙ্গে ইন্দির ঠাকরুণের বিবাহ হইয়াছিল। স্বামী বিবাহের পর কালে ভদ্রে এখানে পদার্পণ করিতেন। এক-আধ রাত্রি কাটাইয়া পথের খরচ ও কৌলীন্য - সম্মান আদায় করিয়া লইয়া খাতায় দাগ আঁকিয়া পরবর্তী নম্বরের শ্বশুরবাড়ী অভিমুখে তলপি - বাহক সহ রওনা হইতেন, কাজেই স্বামীকে ইন্দির ঠাকুরণ ভাল মনে করিতেই পারে না।...কত ভিটায় নতুন গৃহস্থ বসিল, কত ভিটা জনশূন্য হইয়া গেল, কত গোলোক চক্রবর্তী, ব্রজ চক্রবর্তীমরিয়া হাজিয়া গেল, ইছামতীর চলোর্মি-চঞ্চল স্বচ্ছ জলধারা অনন্ত কাল-প্রবাহের সঙ্গে পাল্লা দিয়া কুটার মত, ঢেউয়ের ফেনার মত, গ্রামের কত জনসন টম্‌সন সাহেব, কত মজুমদারকে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গেল। শুধু ইন্দির ঠাক্‌রণ এখনও বাঁচিয়া আছে।
>
> (পথের পাঁচালী - প্রথম পরিচ্ছদ)

সর্বজয়ার তাড়া খেয়ে এ হেন ইন্দিরের মৃত্যু উপন্যাসে একরকম, ছবিতে আরেকরকম। উপন্যাসে তা ধীরে ধীরে ঘনিয়েছে, ছবিতে তা ভীষণ আকস্মিক। কাশবন, ট্রেন দেখার আনন্দের পর-পরই কাউন্টার পয়েন্টের মতো বাঁশবনে অভুক্ত মৃত ইন্দিরকে অপু - দুর্গা আবিষ্কার করে। এতে আমরা ধাক্কা খাই বটে, কিন্তু বিভূতিভূষণ যেভাবে ইন্দিরের মৃত্যু বর্ণনা করেছেন, তাতে আমরা আরও বেশি ধাক্কা খাই। 'ইন্দির ঠাকরুণের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নিশিন্দিপুর গ্রামে সেকালের অবসান হইয়া গেল।' শুধু নিশিন্দিপুর কেন, ইন্দির যেন যক্ষের মতো বাংলার একটা সময়ের ইতিহাস আগলে বসেছিল। ছবির ইন্দিরকে দেখে এরকম অনুভূতি জাগে না। সে অনেক বেশি তীক্ষ্ণ কিন্তু উপন্যাসের মতো ব্যাপ্ত নয়।

সত্যজিৎ নিজেই লিখেছেন, 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের বারো আনা ঘটনাই ছবিতে ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি; সেই সঙ্গে চরিত্রও বাদ পড়েছিল অজস্র।' (পথের পাঁচালী চিত্রনাট্য প্রসঙ্গে -এক্ষণ, শারদীয় ১৩৯০)। আসলে উপন্যাসের নির্দিষ্ট কোনও কলেবর নেই। তা একশো পাতার হতে পারে, আবার হাজার পাতারও হতে পারে। সিডি, ভিডিওর দৌলতে সিনেমা হাতের মুঠোয় চলে আসছে, এবার হয়তো তার দৈর্ঘ্য বাড়বে, বই-এর মতো সময় সুযোগ অনুযায়ী খেপে খেপে দেখে নেওয়া যাবে। 'পথের পাঁচালী'র জমানায় তা ছিল না। সিনেমা ছিল একান্তভাবে হলে বসে দেখার জিনিস। দু-আড়াই ঘন্টার মধ্যে আটকে না রাখলে দর্শকের অন্যঅসুবিধে হয়ে যেত। ফলে অনেক কাটছাঁট হয়েছে। সারা বই জুড়ে দেখি অপুর ভীষণ পড়ার অভ্যেস। সে পদ্মপুরাণ, চণ্ডী মাহাত্ম্য, বীরাঙ্গনা কাব্য, মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত, রাজপুত জীবন সন্ধ্যা, বঙ্গবাসী পত্রিকা সবই চেয়েচিন্তে, ধার করে, ভিক্ষে করে পড়ে ফেলে এবং অদ্ভুত সব কল্পনার জগতে ঘুরে বেড়ায়। অপু যে শুধু পড়ত তাই নয়, নাটক লিখত, গল্পও লিখত। 'পথের পাঁচালী' ছবিতে এমন ইঙ্গিত কোথাও নেই, 'অপরাজিত'তেও নেই। থাকলে অনেক যুক্তিযুক্ত হত। কারণ 'অপুর সংসার'-এ দেখি অপু পুলুকে বলছে সে একটা উপন্যাস লিখছে। আসলে একটি শিশু বই পড়তে ভালোবাসে এবং লেখে-এর মধ্যে না আছে নাটকীয়তা, না আছে তেমন ভিসুয়াল সম্ভাবনা। 'পথের পাঁচালী' করার সময়ে এ দুটি দ্বারা সত্যজিৎ সবচেয়ে বেশি তাড়িত হয়েছিলেন। বিভূতিভূষণের অপুরআরেকটা গুণ ছিল সে ভাল গান গাইত। গানের গলা তার এত ভাল ছিল যে যাত্রা দলে যোগ দেওয়ার জন্য সে অধিকারীর কাছ থেকে অফারও পেয়েছিল। সত্যজিৎ অপুর এই গুণটা ত্যাগ করেছেন। অপুকে খুঁজে বার করতে তাঁর যথেষ্ট ভোগান্তি হয়েছিল, এর উপর গান - গাওয়া অপু পেতে হলে কী হত কে জানে। বিচ্ছিন্নভাবে অপুর আরও কিছু ক্রিয়াকলাপ উপন্যাসে আছে যা হয়তো ছবিতে রাখা যেত। যেমন অপুর প্রথম চুরুট খাওয়ার অভিজ্ঞতা, পাছে কেউ গন্ধ পায় এই ভয়ে বারবার কুল চিবিয়ে বাড়ি ঢোকা। ওইবয়সের অধিকাংশ বালক এসব ঘটায় কারণ তারা বড়দের জগতের অংশীদার হতে চায়।

তবে কিছু দৃশ্য সত্যজিৎ ঠিকঠাক করে উঠতে পারেননি অর্থাভাব এবং সময়াভাবের কারণে। যেমন ছবিতে বৃষ্টি আছে বটে, কালবৈশাখী নেই। উপন্যাসে দুটিই ছিল। প্রথমে কালবৈশাখী এল, অপু-দুর্গা ছুটল ভুবন মুখুজ্যেদের বাগানে আম কুড়োতে, যথারীতি সেখান থেকে ছেলেপুলেদের তাড়া খেয়ে তারা গড়ের পুকুরের দুর্ভেদ্য জঙ্গলে ঢোকে আমের সন্ধানে। সেখানে তারা বৃষ্টির কবলে পড়ে যায়। উপন্যাসের এই ক্রম ছবিতেও থাকার কথা ছিল। 'অপু ইস্কুল থেকে বাড়ি ফিরছে। আকাশে মেঘ জমছে। দুর্গা পুণ্যিপুকুর পুজো শেষ করল। ঝড় এসে পড়ল। দুর্গা ছুটে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। অপু জানলা দিয়ে বইখাতা ফেলে দিয়ে তার পেছন পেছন ছুটল। এইখানে ঝড়ে আম পড়া, অপু-দুর্গার আম কুড়োনোর দৃশ্য থাকার কথা

ছিল। আর্থিক অভাবে বছরের ঠিক সময়টা বেছে নিয়ে ঝড়ের দৃশ্য তোলা সম্ভব হয়নি।' (পথের পাঁচালীর নেপথ্যে -অনিল চৌধুরী, এক্ষণ শারদীয়া ১৩৯০) পশ্চিম বঙ্গ সরকার টাকা স্যাংসন করেদেবার পরও এই অর্থাভাব ঘটেছিল সরকারি দপ্তরের গয়ংগচ্ছ তার জন্য। 'ওই রকমের বৃষ্টি তো জুলাই আগস্ট মাসেই পড়ে, তা সেই সময়ে সরকারি দফতর ব্যস্ত ছিলেন আমাদের হিসেব পরীক্ষার কাজে। ফলে, পরের কিস্তির টাকা যখন এল, বর্ষাকাল তখন শেষ হয়ে গেছে।' (অপুর পাঁচালি -সত্যজিৎ রায়) এ-ধরনের দৃশ্য হচ্ছে টাইম ফ্যা*র সিকোয়েন্স। ঠিক মুহূর্তটি ধরতে না পারলে তা অধরাই থেকে যায়। আমলারা এসব বোঝেন না কারণ তাদের কাজ খাতায় কলমে, হাতেনাতে নয়। ফলত আমলাতান্ত্রিক জটজালে জড়িয়ে একটি চিরায়ত সৃষ্টিতে বিরাট খুঁত থেকে গেল। আজ যখন পরিবেশ বিপর্যয়ের ফলে কালবৈশাখী বিলীন হয়ে যাচ্ছে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে এসব ছবি দেখিয়ে বোঝানো যেত কালবৈশাখী ব্যাপারটা কী।

আবার অন্য একটি দৃশ্য কিছুটা তুলে কেন বাদ দেওয়া হয়েছিল তার কোনও ব্যাখ্যা সত্যজিৎ দেননি। গড়ের পুকুরে পানিফল তুলতে গিয়ে অপু আর দুর্গা চকচকে পলকাটা একটা জিনিস খুঁজে পায়। তাদের ধারণা হয়েছিল সেটা হীরে। কারণ ওই জঙ্গলে মজুমদারদের পোড়ো ভিটেয় কারা নাকি মোহর খুঁজে পেয়েছিল। সর্বজয়াও জিনিসটি পেয়ে হীরের স্বপ্ন দেখতে থাকে, এবার তাদের দারিদ্র কেটে যাবে। হরিহর ফিরলে সব দেখে ঘোষণা করে, ' এ একরকম বেলোয়ারি কাচ, ঝাড়লণ্ঠনে ঝুলানো থাকে। রাস্তাঘাটেযদি হীরে জহরৎ পাওয়া যেত তা হলে ... তুমিও যেমন।' অনিল চৌধুরী জানিয়েছেন, 'সেই কাচ দেখানোর দৃশ্যটা লাইটের অনেককৌশল করে তোলা হয়। দুর্গা কাচটা হাতে নিয়ে ঘোরাচ্ছে আর সেটার ওপর থেকে আলো ঠিকরে দুর্গার মুখের ওপর পড়ছে। পরে প্রচণ্ড আর্থিক কষ্টের মধ্যে সর্বজয়ার একবার সেই কাচের টুকরাটার কথা মনে হয় যদি সত্যি সেটা হীরে হয়। কিন্তু ওই পরের অংশটা আর তোলা হয়নি। হয়তো সত্যজিৎবাবু পরিকল্পনাটা বদলেছিলেন।' (পথের পাঁচালীর নেপথ্যে অনিল চৌধুরী) এই দৃশ্যটির একটি স্টিল - marie Seton-এর গ্রন্থ Portrait of a Director Satyajit Roy এবং এক্ষণ, শারদীয় ১৩৯০ সংখ্যায় ছাপা আছে।

'পথের পাঁচালী' ছবির সিংহভাগ জুড়ে আছে ছ-বছরের অপু। আঁতুড়ঘরে একবার এবং পাঁচমাস বয়সের অপুকে ঘুমন্ত অবস্থায় আরেকবার দেখা গেছে। দশ মাসের অপুর সম্পর্কে বিভূতিভূষণ আরও কিছু বর্ণনা দিয়েছেন। তার অর্থহীন গান গাওয়ার চেষ্টা, উঠোনে খেলতে খেলতে হঠাৎ নিশ্চুপ হয়ে যাওয়া এবং সর্বজয়ার ভয় শেয়ালে নিয়ে গেল কিনা এবং সর্বোপরি অনবদ্য একটিছত্র-

> সকাল হইতে সন্ধ্যা ও সন্ধ্যা হইতে অনেক রাত্রি পর্যন্ত তাহাদের বাঁশবাগানের ধারে নির্জন বাড়ীখানি দশ মাসের শিশুর অর্থহীন আনন্দ - গীতি ও অবোধ কলহাস্যে মুখরিত থাকে। মা ছেলেকে স্নেহ দিয়া মানুষ করিয়া তোলে, যুগে যুগে মায়ের গৌরব -গাথা তাই সকল জনমনের বার্তায় ব্যক্ত। কিন্তু শিশু যা মাকে দেয়, তাই কি কম? সে নিঃস্ফআসে বটে, কিন্তু তার মন - কাড়িয়া - লওয়া-হাসি, শৈশবতারল্য, চাঁদ ছানিয়া গড়া মুখ, আধ-আধ আবোল - তাবোল বকুনির দাম কে দেয়? ওই তার ঐশ্বর্য্য, ওরই বদলে সে সেবা নেয়, রিক্ত হাতে ভিক্ষুকের মত নেয় না। (পথের পাঁচালী-চতুর্থ পরিচ্ছেদ)

এর তুল্যমূল্য দৃশ্যকল্প ছবিতে নেই। আসলে পাঁচ-দশ মাসের এই মানবক গোষ্ঠিকে নিয়ে শুটিং করা ভারি ঝক্কি। সে পরিচালকের কোনও নির্দেশ মানবে না, নিজের মতো আচরণ করবে, তাকে নিয়ে কাজ করা আর ওয়াইল্ড লাইফ শুটিং করা প্রায় এক। আজকাল বেবি প্রোডাকটের বিভিন্ন বিজ্ঞাপনে যেসব ওই বয়সী বাচ্ছা দেখা যায় তাদের এক একটি শট পেতে সারা দিন কেটে যায়। এই যেখানে অবস্থা সেখানে 'Baby's Day out'-এর মতো পূর্ণদৈর্ঘের একটি ছবি কীভাবে শুটিং হল তা গবেষণার বিষয় হতে পারে। সত্যজিতের এত আয়োজন বা সামর্থ্য ছিল না। কিন্তু অপু জন্মাল আর লাফিয়ে ছ-বছরের হয়ে গেল সেটাও করা যায় না। মাঝের অবস্থাটা দর্শক একবার দেখতে চাইবেই। তিনি ভীষণ চাতুর্যের সঙ্গে পাঁচ মাসের অপুকে একবার দোলনায় ঘুমন্ত দুলিয়ে সে কাজ সমাধা করেছেন। 'অপুর সংসার'-এ একই টেকনিকে ওই বয়সী কাজলকে একবার মাত্র দোলনায় ঘুমন্ত দেখিয়ে তিনি পত্রপাঠ বিদেয় করেছিলেন। তবে মুনসিয়ানা এই যে অপর্ণার হঠাৎ মৃত্যুর আকস্মিকতা, অপর্ণার মার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না, কাঁথা সেলাই করা, দোলনার ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ ইত্যাদির প্রভাবে child artist handling -এর এই কৌশল চাপা পড়ে যায়। একইভাবে 'পথের পাঁচালী'র আলোচ্য দৃশ্যে ঘুমন্ত অপুর পাশাপাশি তিনি এনেছেন ইন্দিরের গান এবং সর্বজয়া ও হরিহরের দাম্পত্য দৃশ্য। ছবিতে এই প্রথম আমরা দুজনকে একসঙ্গে দেখি, এই প্রথম হরিহরের কথা শুনি দৃশ্যটি এত highly informative, হরিহর কী করে, কী করতে চায়, সর্বজয়ার সঙ্গে এতরকম খুঁটিনাটি কথা চলতে থাকে যে আমাদের মনোযোগ সেই দিকে চলে যায়। এর পরের দৃশ্যেই আমরা দেখি ছ-বছরের অপু পাঠশালায় যাচ্ছে। বোঝা যায় সত্যজিৎ একটি দৃশ্যে হরিহরের সাংসারিক পরিকাঠামোটি মেলে ধরতে চেয়েছেন। যাতে দ্রুত ছবিটিকে অপুর দৃষ্টিকোণে প্রোথিত করা যায়। পাঁচ মাসের অপুকে নিয়ে তা করা সম্ভব নয়। সর্বজয়া এবং ইন্দিরের দুয়েকটি কথোপকথন বাদ দিলে যৌথভাবে অপু - দুর্গা অথবা একভাবে অপু কী দুর্গা উপস্থিত হয় এমন দৃশ্য ছবিতে প্রায় নেই। ফলে হরিহরের প্রেজেন্স অনেক কমে গেছে। হরিহরের মাঝে মধ্যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়া, যজমানদের বাড়ি ঘুরে বেড়ানো, কাজের চেষ্টা ইত্যাদির মধ্যে একটা ভাবালু মানুষের সংগ্রাম ফুটে উঠেছে। সত্যজিৎ এ-দিকটা দেখাননি। উপন্যাসের সঙ্গে ছবির এ এক বড় পার্থক্য।

দুর্গার প্রসঙ্গে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ যে অংশটি ছবিতে বাদ গেছে তা হল তার তুচ্ছ জীবনেও একবার রোমান্স এসেছিল। জমি জরিপের সময় গ্রামের অবস্থাপন্ন গৃহস্থ অন্নদা রায়ের জ্ঞাতি ভাইপো নীরেন তার অংশ বুঝে নেওয়ার জন্য এসে হাজির হল। তার বয়স একুশ বাইশ, বলিষ্ঠ গড়ন, কলকাতায় আইন পড়ে, জরিপের কাজ বোঝে না, দিনরাত নভেল পড়ে। নীরেনকে সর্বজয়া অতি উৎসাহে বাড়িতে নেমন্তন্ন করে মোটা চালের ভাত, তেল-ঘি বিহীন রান্না, পানসে পায়েস ইত্যাদি খাওয়ায়। পাড়া- প্রতিবেশীদের কেউ কেউ নীরেনের সঙ্গে দুর্গার বিয়ের কথা ভাবতে থাকে। একদিন আমবাগানে দুর্গা নীরেনের সামনে পড়ে গেল। তার কোঁচড় ভর্তি মেটে আলু। দুর্গা খুব অবাক হয় এত বিদ্বান লোক মেটে আলু চেনে না। এরপর বিভূতিভূষণের বর্ণনা-

> দুর্গাকে ইহার আগে নীরেন কখনও ভাল করিয়া দেখে নাই। চোখ দুটির অমন সুন্দর ভাব কেবল দেখিয়াছে ইহারই ভাই অপুর মধ্যে। যেন পল্লীপ্রান্তের নিভৃত চ্যুত - বকুল - বীথির প্রগাঢ় শ্যাম - স্নিগ্ধতা ডাগর চোখ দুটির মধ্যে অর্ধসুপ্ত রহিয়াছে।প্রভাত এখনও হয় নাই, রাত্রি শেষের অলস অন্ধকার এখনও জড়াইয়া। তহে তাহা প্রভাতের কথা স্মরণ করাইয়া দেয় বটে, কত সুপ্ত আঁখির জাগরণ, কত কুমারীর ঘাটে যাওয়া, ঘরে ঘরে কত নবীন জাগরণের অমৃত উৎসাহে- জানালায় জানালায় ধূপগন্ধ।
>
> দূর্গা খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া কেমন যেন উসখুস করিতে লাগিল। নীরেনের মনে হইল সে কি বলিবে মনে করিতে পারিতেছে না। সে বলিল খুকী, তোমাকে আর একটু এগিয়ে দিই? চল তোমাদের বাড়ীর সামনে দিয়েই যাই
>
> দুর্গা ইতস্তত করিতে লাগিল, পরে একটু মুখ টিপিয়া হাসিল। নীরেনের মনে হইল এইবার সে কথা বলিবে। পরক্ষণে কিন্তু দুর্গা ঘাড় নাড়িয়া তাহার সহিত যাইতে হইবে না জানাইয়া দিয়া, বাড়ীর পথ ধরিয়া চলিয়া গেল।'
>
> (পথের পাঁচালী-অষ্টদশ পরিচ্ছেদ)

নীরেনের আগমনের পর দুর্গার সরল কুমারী মনে দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। রানুদের বাগানে একবার সে একটা সুদর্শন পোকা দেখতে পায়। গ্রাম্য বিশ্বাসের সুদর্শন পোকা ঠিক পোকা নয়, ঠাকুর তাকে মনের ইচ্ছে জানালে তা পূর্ণ হয়। দুর্গা কপালে হাত ঠেকিয়ে আবৃত্তি করতে থাকে, 'অপুকে ভাল রেখে, মাকে ভাল রেখো, ওপাড়ার খুড়ীমাকে ভাল রেখো) পরে একটু ভাবিয়া ইতস্তত করিয়া বলিল - নীরেনবাবুকে ভাল রেখো, আমার বিয়ে যেন ওখানেই হয় সুদর্শন' আবার তার মনে কখনও কখনও অন্যরকম দোলা তৈরিহয়,

> 'দুর্গা আজকাল যেন এই গাছপালা, পথঘাট, এই অতি পরিচিত গ্রামের প্রতি অন্ধি - সন্ধিকে অত্যন্ত বেশী করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিতেছে। আসন্ন বিরহের কোন বিষাদে এই কত প্রিয় গাবতলার পথটি, ওই তাহাদের বাড়ীর পিছনের বাঁশবন, ছায়া - ভরা নদীর ঘাটটি আচ্ছন্ন থাকে। তাহার অপু - তাহার সোনার খোকা ভাইটি, যাহাকে একবেলা না দেখিয়া সে থাকিতে পারে না, মন হুহু করে - তাহাকে ফেলিয়া সে কতদূর যাইবে!' এমন কী অপু একবার বলেও ফেলে)
>
> 'একটা কথা বলব দিদি? তোর সঙ্গে মাস্টার মশায়ের বিয়ে হবে-'
>
> দুর্গার লজ্জা হইল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার অত্যন্ত কৌতূহলও হইল, কিন্তু ছোট ভাই - এর কাছে এর - সম্বন্ধে কোনো কথাবার্তা বলিতে তাহার সঙ্কোচ হওয়াতে সে চুপ করিয়া রহিল।
>
> অপু আবার বলিল - খুড়ীমা বল্‌ছিল রাণুর মায়ের কাছে আজ বিকালে। মাস্টার মশায়ের নাকি অমত নেই-
>
> কৌতূহলের আবেগে চুপ করিয়া থাকা অসম্ভব হইয়া উঠিল। সে তাচ্ছিল্যের সুরে বলিল হ্যাঁ বলছি যাঃ তোর সব যেমন কথা-
>
> অপু প্রায় বিছানায় উঠিয়া বসিল, সত্যি বল্‌চি দিদি, তোর গা ছুঁয়ে বল্‌ছি। আমি সেখানে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখেই তো কথা উঠ্‌ল। বাবাকে দিয়ে পত্তর লেখাবে সে মাস্টারমশায়ের বাবা যেখানে থাকেন সেখানে)
>
> -মা জানে?
>
> -আমি এসে মাকে জিগ্যেস করবো ভাবলাম - ভুলে গিইচি। জিজ্ঞেস করবো দিদি? মা বোধ হয় শোনেনি, কাল খুড়ীমা মাকে ডেকে নিয়ে বল্‌বে বল্‌ছিল)

পরে সে বলিল) তুই কত রেলগাড়ী চড়বি দেখিস, মাস্টারমশাইরা থাকেন এখান থেকে অনেক দূরে রেলে যেতে হয়)
দুর্গা চুপ করিয়া রহিল।' (পথের পাঁচালী অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ)

ছবিতে বিয়ের প্রসঙ্গ একবার এসেছে, তা-ও হালকাভাবে। চড়ুইভাতির দৃশ্যে খেতে খেতে রাণু আর দুর্গার মধ্যে কথা হয়-

দুর্গা ঃ তোর বিয়ের আর কদ্দিন আছে রে?
রাণু ঃ (লাজুকভাবে) জানি না।
দুর্গা ঃ আমি বলব? বলি?
রাণু ঃ (হেসে) বল
দুর্গা ঃ আর দু'মাস দশদিন। তাই না?
রাণু ঃ (ঘাড় নেড়ে হাসে) হ্যাঁ।
দুর্গা ঃ তোর কিরকম লাগছে রে?
রাণু ঃ আর সবাইর যেরকম লাগে!
দুর্গা ঃ কি রকম লাগে?
রাণু ঃ তোর যখন হবে তখন তুই বুঝবি।
দুর্গা ঃ আমার হবেই না।
রাণু ঃ হবে। নিশ্চয়ই হবে।
দুর্গা ঃ আমি জানি হবে না।
রাণু ঃ হবে। তোর মা তোর জন্য পাত্র দেখছেন।
দুর্গা ঃ (বিশ্বাস করে না কিন্তু খুশি হয়) ধেৎ।
রাণু ঃ সত্যি। তুই জিগ্যেস করিস

(সম্পূর্ণ চিত্রনাট্য পথের পাঁচালী - সত্যজিৎ রায় এক্ষণ শারদীয় ১৯৩০)

বিভূতিভূষণের ওই এ'প্রেশন 'কৌতূহলের আবেগ', দুর্গার প্রশ্ন) 'মা জানে', যেন জানলেই ভালো হয় এবং স্ক্রিপ্টে সত্যজিৎ রায়ের নোট, 'বিশ্বাস করে না, কিন্তু খুশি হয়') এগুলোর যেন একটা সাযুজ্য ছিল। এরপর ছবিতে কোথাও দুর্গার বিয়ের প্রসঙ্গ আসেনি, সর্বজয়া দুর্গার জন্য কেমন পাত্র খোঁজ করছিল বলা হয়নি। মনে হয় এ নিয়ে সত্যজিতের মনে কোথাও দ্বিধা কাজ করেছে। ফলে ছবির মধ্যে একটা সম্ভাবনা ফুটতে না ফুটতে অর্ধস্ফুট থেকে যায়। 'অপরাজিত' ছবিতে লীলাকে নিয়ে সত্যজিতের একই সংশয় ছিল এবং সেটা তিনি স্বীকারও করেছেন-

'চিত্রনাট্যে লীলার স্থান ছিল, অথচ তার ফলে ছবির দৈর্ঘ্য বেড়ে যাচ্ছিল। তাই আমার মনে প্রথম থেকেই লীলা চরিত্র সম্পর্কে একটা দোনামনা ভাব ছিল। পাঠকের এক পরিচিত ও প্রিয় চরিত্রকে বর্জন করার কথাও ভাবতে পারছিলাম না। আবার চরিত্রটিকে দায়সারাভাবে নাম -কা-ওয়াস্তে উপস্থিত করতেও মন চাইছিল না। শেষ পর্যন্ত অবশ্য লীলা বাদই গেল, আর সম্পূর্ণ ছবি দেখার পর এ কথাও আমার মনে হয়নি যে তার ফলে সমগ্র ছবি বা অপুর চরিত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।... বরং লীলা থাকলে অপু-সর্বজয়া -লীলা মিলে একটা ত্রিকোণের সৃষ্টি হতে পারত, যেটা ছবির পক্ষে মঙ্গলকর হতো বলে আমার মনে হয় না।';

(চিত্রনাট্য প্রসঙ্গে সত্যজিৎ রায়। এক্ষণ শারদীয় ১৩৯১)

সত্যজিতের প্রথম চারটি ছবি হল 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত', 'পরশ পাথর' এবং 'জলসাঘর,'। অপুর সংসার -!এ অপর্ণার আবির্ভাবের আগে রোমান্টিক প্রেম বলতে যা বোঝায় তা এই চারটি ছবির কোনওটাতেই আসেনি। একী শুধু কাকতালীয়, নাকি মানব সম্পর্কের এই দিকটা তিনি এড়িয়ে চলছিলেন। অন্তত গল্প বাছাই -এর ঢং দেখে তাই মনে হয় নাকি গড়পড়তা বাংলা ছবিতে প্রেমের ঘনঘটা বেশি চলছিল বলে বিষয় - বৈচিত্র্যের দিকে ঝুঁকেছিলেন। যাই হোক উপন্যাসের নীবেন তো যথারীতি একদিন শহরে চলে গেল। দুর্গার ট্রেনে চড়ে শ্বশুরবাড়ি যাওয়া হল না, সে ট্রেনটাই দেখতে পেল না, মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। গ্রাম্য একটি মেয়ের সঙ্গে শহরের আধুনিক যুবার রোমান্স এই বিষয়টি পরে অন্যভাবে এসেছিল 'সমাপ্তি' ছবিতে। আপাতত যেটা লক্ষণীয়, সত্যজিৎ অপু এবং দুর্গাকে বাল্য এবং কৈশোরেই আটকে রেখেছেন। তারা ট্রেন দেখেছে, মৃত্যু দেখেছে, দারিদ্র্য কী আঁচ পেয়েছে, খাওয়ার জন্য ছোঁক ছোঁক করেছে, জল জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়েছে। তাদের মধ্যে বিস্ময়বোধটা বেশি। তুলনায় বিভূতিভূষণের অপু-দুর্গা মানসিকভাবে একটু যেন বড় এবং দড়। অপু বই পড়ে, গল্প লেখে, যাত্রাদলের অভিনেতার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতায়, চুরুটে টান দেয়। দুর্গা বিয়ের কথা ভাবে, শুধু পুঁতির মালা নিয়ে যে সন্তুষ্ট নয়, তার ইপ্সিত বস্তু হচ্ছে সিঁদুর কৌটা। সত্যজিৎ আসলে এক বছরের একটিপরিসরে ছবিটিকে বিন্যস্ত করতে চেয়েছিলেন। 'অপুর পাঠশালায় যাবার দিন থেকে শুরু করে দুর্গার মৃত্যু অবধি এক বছর সময় কল্পনা করে চিত্রনাট্যের ঘটনাগুলিকে ঋতু অনুসারে ভাগ করে ফেলা হয়েছিল।' (চলচ্চিত্র - রচনা আঙ্গিক, ভাষা ও ভঙ্গি - সত্যজিৎরায়) বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালী যে কদিন ধরে ঘটেছে তার কোন নির্দেশিকা উপন্যাসে নেই। এক বছরের মধ্যে একটি বাচ্চা কতআর বড় হয়! কিন্তু 'অপরাজিত' ছবির কাশী - পর্বেও বিশেষ পালটায় না, সে শুধু দেখে বেড়ায়। অপু সম্পর্কে যদি বা এটা মেনে নেওয়া যায়। দুর্গার মধ্যে কিছু মেয়েলি উন্মেষ থাকা দরকার ছিল। 'পথের পাঁচালী'তে একবারই শুধু মনে হয়েছে অপু বড় হয়েউঠেছে। নিশ্চিন্দিপুর ছেড়ে যাবার মুহূর্তে যখন সে দুর্গার চুরি করা পুঁতির মালাটা খুঁজে পায় এবং পানাপুকুরে ফেলে দেয়, দিদির ছোট্ট একটা লোভ, ছোট্ট একটা অপরাধকে চিরকালের মতো লুকিয়ে রাখতে চায়। এই আচরণে শিশুসুলভ সারল্য যেমন আছে, তেমন আছে এক্ষধরনের ডিপ্লোম্যাসি। সব মিলিয়ে উপন্যাস এবং ছবির ইন্দির, হরিহর, অপু ও দুর্গাতে খুব সূক্ষ্ম হলেও ফারাক আছে। একমাত্র সর্বজয়া যথাযথ। সংসারের প্রতি তার আসক্তি, ইন্দিরের প্রতি তার বিরক্তি, তার স্বার্থত্যাগ এবং স্বার্থপরতা উপন্যাসে যতটুকু, ছবিতে ততটুকুই আছে। পার্থক্য থাক বা না থাক, এটা বলতেই হবে মূল কটি চরিত্র নিয়ে সত্যজিতের ইমেজারি এত তীব্র যে আঝও যখন পথের পাঁচালী পড়ি তখন তার থেকে আর বেরোতে পারি না। ইন্দির যেন চুনিবালাই, আর কেউ নয়, হরিহর যেন কানুবাবুই, আর কেউ নয়। অপু, দুর্গা, সর্বজয়াও তাই। সিনেমাটা না হলে হয়তো এদের অন্যভাবে কল্পনা করতে পারতাম। এটা লাভ নালোকসান বোঝা যায় না। কিন্তু নিশ্চিন্দিপুর সম্পর্কে এরকম মনে হয় না। বিভূতিভূষণের নিশ্চিন্দিপুর আরও ঘন, নিবিড় এবং রহস্যময়।

স্থান - কাল - পাত্র ছেড়ে যদি ঘটনায় আসি তো কম বেশি অনেক পরিবর্তন চোখে পড়ে। উপন্যাসে ছিল দুর্গা আর অপুর চড়ুইভাতিতে বিনি নামের একটি ছোট জাতির মেয়ে জুটে যায়। খেলাঘরে জাতপাতের দূরত্ব থাকলে খেলা জমে না, সেটা ঘুচেও যায়। সত্যজিৎ চড়ুইভাতির দৃশ্যটিতে এ - প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে মেয়েলি বিয়ে কেন্দ্রিক করে দিয়েছেন। উপন্যাসে একই ধরনের ঘটনা বারবার ঘটে। যেমন একবার সে পুঁতির মালা চুরি করে, একবার সোনার সিঁদুর কৌটো। ছবিতে সে একবারই চুরি করেছে। বিভূতিভূষণের ভাষার গুণে পুনরাবৃত্তিতে তেমন খটকা লাগে না। কিন্তু ছবিতে এগুলি খুব বিরক্তিকর হতে পারত। বইতে পুঁতির মালা চুরি করে ধরা পড়ার পর মার খেয়ে সে বাড়ি থেকে বিদায় নেয়, সারাদিন অপু তাকে খুঁজে বেড়িয়ে সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরে দেখে আবার সে মার খেতে খেতে বেরিয়ে গেল। বইতে এগুলি ঘটনার পর ঘটনা হিসেবে এসেছে, ছবিতে এসেছে নির্দিষ্ট ক্লাইম্যাক্স হিসেবে। পরপর দুটো ক্লাইম্যা' যেহেতু হতে পারে না ছবিতে দুর্গা তাই একবারই মার খেয়েছে এবং সেটা চূড়ান্ত মার।একই কথা প্রযোজ্য দুর্গার মৃত্যুর পর সর্বজয়ার শোক প্রসঙ্গে। বইতে মারা যাওয়ার পর সে পাড়া মাথায় করে কাঁদে, আবার হরিহর ফিরলেও সে কান্নায় ভেঙে পড়ে। ছবিতে প্রথমে সে স্তম্ভিত, এক ফোঁটা জল তার চোখ দিয়ে বেরোয় না বলেই হরিহর ফেরার পর তাদের মিলিত কান্না সঠিক ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছে যায়। উপন্যাস থেকে চলচ্চিত্রে যে পরিবর্তনটি নিয়ে সবচেয়ে গোল বেধেছে তা হল উপন্যাসে দুর্গা ট্রেন দেখেনি, ছবিতে দুজনেই তা দেখতে গিয়েছিল, কিন্তু দুর্গা শেষ মুহূর্তে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। তবু অত কাছে গিয়ে তার পক্ষে ট্রেন না দেখা সম্ভব নয়। অথচ দুর্গা যখন অসুস্থ তখন অপুকে বলে, 'এবার জ্বর সারলে আবার রেলগাড়ি দেখতে যাব। আগে থাকতে যাব তাহলে ঠিক দেখতে পাব।' মারা যাওয়ার আগে এটাই ছিল দুর্গার শেষ আকাঙ্খা।

'কাশবনের দৃশ্যে সত্যজিৎ বাবুর পরিকল্পনা ছিল খুব ভালো করে দেখানো যে অপু ট্রেন দেখতে পলে, দুর্গা পেলনা। গল্পের দিক থেকে একটা খুব তাৎপর্যপূর্ণ সেই কাশবনের দৃশ্যের শেষে অপু যখন ট্রেন দেখতে পায় তখন দেখা যায় দুর্গা ছুটতে ছুটতে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। তাতে কিন্তু দর্শক খুব ভাল করে বুঝতে পারে না যে দুর্গা ট্রেন দেখতে পায়নি। এর জন্য

আরেকদিন শুটিং করা দরকার ছিল। সেটা আমরা করতে পারিনি। এই ত্রুটিগুলো 'পথের পাঁচালী'তে যে থেকে গিয়েছে, তার মূল কারণ আর্থিক। না হলে সত্যজিৎবাবু যা খুঁতখুঁতে লোক, আর খুঁটিনাটি ব্যাপারের দিকে যতটা মনোযোগ, তাতে আর্থিক সংগতি থাকলে ওই শটগুলো নিশ্চয় রিটেক করা হত।' (পথের পাঁচালীর নেপথ্য - অনিল চৌধুরী)

সত্যজিৎ নিজেই বলেছেন, 'পথের পাঁচালীর'র পূর্ণাঙ্গ চিত্রনাট্য কখনও তৈরি করা হয়নি। থাকবার মধ্যে ছিল শুধু একতাড়া কাগজে লেখা কিছু নোট আর কিছু স্কেচ।' (অপুর পাঁচালী - সত্যজিৎ রায়)। সেইজন্যই কি এই ভ্রান্তিটা হয়ে গেল? অনিল চৌধুরীর কথা থেকে বোঝা যায় দৃশ্যটি শুটিং -এর দিক থেকে অসম্পূর্ণ ছিল বা কিছু শট নেওয়া যায়নি এমন নয়, রিটেক করার দরকার চিল। রিটেকের কথা তখন ওঠে যখন শুটিং -এ গোলমাল থেকে যায়। পরবর্তী সময়ের সত্যজিৎকে আমরা পুরো স্ক্রিপ্ট এবং অন্যান্য ডিটেলসহ যতটা পুঙ্খানুভাবে কাজ করতে দেখি সেখানে প্রথম ছবিতে পূর্ণাঙ্গ স্ক্রিপ্ট ছাড়া শুটিং-এ নেমে পড়াটা বেশ বিস্ময়কর।যদিও তিনি বলেছেন, 'ছবিতে এই কাহিনী কোথায় কীভাবে ফুটবে, সেটা বুঝবার জন্য পূর্ণাঙ্গ চিত্রনাট্যের দরকারও যে আমার ছিল না, তার কারণ, একে তো পুরো কাহিনীটাই আমার মনের মধ্যে একেবারে গেঁথে গিয়েছিল, তার উপরে আবার ডি.কে.র করা সারাংশ আর চিত্রনাট্যের মূল উপাদানের মধ্যে সাযুজ্যও ছিল কম নয়।' (অপুর পাঁচালী-সত্যজিৎ রায়) তবু কাজের এই পদ্ধতি বেশ অ-সত্যজিতীয়। 'পথের পাঁচালী'র আগে সত্যজিৎ আরও কিছু স্ক্রিপ্ট করেছিলেন 'পথের পাঁচালী করার আগেই আমি 'ঘরে বাইরে' ওঅন্যান্য কয়েকটি বাংলা গল্প উপন্যাসের (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিলামসন' শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ঝিন্দের বন্দী' ইত্যাদি) চিত্রনাট্য লিখি।' (পথের পাঁচালী চিত্রনাট্য প্রসঙ্গে - সত্যজিৎ রায়) অথচ 'পথের পাঁচালী'র ক্ষেত্রে এটা হল না। তার কারণ কি শুধুমাত্র পুরো ছবিটা তাঁর মাথায় ছিল বলে, নাকি প্রতি মূহূর্তে তা তাঁর মাথায় গড়ে উঠছিল বলে? কিছু জিনিস তিনি সুস্পষ্টভাবে ছকে রেখেছিলেন, যেমন ওই এক বছরের ক্রমটি এবং ঋতুচক্রের ব্যাপারটি। আবার অনেকটাই ছকা ছিল না, মনের মধ্যে ছিল। যে কোনও সৃষ্টিকর্মে একজন শিল্পী ততক্ষণই বিষয়টি মাথায় রাখেন যতক্ষণ সেটা গ্রো করতে থাকে। নচেৎ কংক্রিট চেহারা পেলেই হয় তিনি সেটা লিখে ফেলবেন, অথবা এঁকে ফেলবেন অর্থাৎ এ'প্রেস করার দিকে যাবেন। 'পথের পাঁচালী' করার প্রতিটি পর্যায়ে সত্যজিৎকে যেমন লড়তে হয়েছে বাজেটের সঙ্গে, পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে, তেমন লড়তে হয়েছে উপন্যাসের সঙ্গে, নিজের সঙ্গে। প্রতি পদে পদে তাঁকে করে করে দেখতে হয়েছে ঠিক হচ্ছে কি না। এই প্রক্রিয়া স্ক্রিপ্ট পর্ব থেকেই শুরু হয়ে যায়। ১৯৮৩ সালে 'এক্ষণ' পত্রিকা শারদ সংখ্যায় যখন স্ক্রিপটি প্রথম প্রকাশ পেল, তার সঙ্গে নির্মাল্য আচার্যর লেখাটি পড়ে বোঝা যায় তিনি চিত্রনাট্যের এই অ্যামিবাসুলভ বেড়ে বেড়ে ওঠার ঘটনাটি বুঝতে পেরেছিলেন।

'পথের পাঁচালী' ছবি করার ভাবনা থেকে ছবিটি শেষ করা পর্যন্ত দীর্ঘ সময় পার হয়েছিল। কাগজে - কলমে প্রাথমিক চিত্রনাট্য অবশ্যই করেছিলেন সত্যজিৎ রায়। নানা সম্ভাব্য প্রযোজককে তা থেকে পড়েও শুনিয়ে ছিলেন। তবে চিত্রনাট্যের এই পর্যায়টিমূলত নিজের ধারণা ও কল্পনাকে নিজের কাছেই ক্রমশ স্পষ্ট করে তোলার জন্য। যত সময় গেছে সেসব চিন্তা ও পরিকল্পনারও ধীরে ধীরে বদল হয়েছে। তাঁর কোনও কোনও পাঁচমেশালি খাতাপত্রে কতকটা ডায়ারির মতো বহু দৃশ্য, নানারকম নোট ও ভাবনা লিখিত হয়েছিল। চিত্রনাট্যের কোনও কোনও অংশের খসড়াও তাঁর ব্যক্তিগত কাগজ পত্রের মধ্যে পাওয়া যায়। কিন্তু সম্পূর্ণ একটি চিত্রনাট্য কোথাও নেই, যেমন তাঁর অন্য সব ছবির আছে।...এইসব কারণে সম্ভবত সত্যজিৎ রায় বহু অনুরোধেও প্রয়োজনের তাগিদেওপরবর্তী কালে প্রকাশের উপযোগী একটি চিত্রনাট্য প্রকাশের চেষ্টা করেন নি।' (সম্পাদকের কথা নির্মাল্য আচার্য। এক্ষণ, শারদীয় ১৩৯০)

এটা ভাবতে আজ বিস্ময়কর লাগে যে - ছবি সারা পৃথিবী জুড়ে আলোড়ন তুলেছিল, ভারতীয় ছবির ধারা বদলে দিল, তার মূল চিত্রনাট্য প্রকাশ পেল 'এক্ষণ' -এর পাতায় ছবিটি মুক্তি পাওয়ার আটাশ বছর পর। অথচ তার আগেই 'পোস্টমাস্টার' (চলচ্চিত্র, ১৯৬১), 'টু' (চিত্রকল্প, ১৯৬৪), 'কাপুরুষ (এক্ষণ, ১৯৬৫), 'অরণ্যের দিনরাত্রি' (এক্ষণ, ১৯৬৯), 'অশনি সংকেত (এক্ষণ, ১৯৭৩), 'পরশ পাথর' (বারোমাস, ১৯৭৫), 'জন - অরণ্য' (এক্ষণ, ১৯৭৬), বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় বেরিয়ে গেছে, 'কাঞ্চনজঙঘা' ও 'নায়ক' ১৯৭২ সালে মিত্র ও ঘোষ থেকে বেরোয় বই হিসেবে। ১০৮০ সালে থেকে 'এক্ষণ' -এ পরপর সত্যজিৎ রায়ের চিত্রনাট্য বেরোতে শুরু করল। ১৮৮৩-র মধ্যে বেরিয়ে গেল 'পিকু,', 'দেবী', 'হীরক রাজার দেশ', 'চারুলতা' এবং 'ফাঁটিকচাঁদ। আমরা তখন চাতক পাথির মতো হা-পিত্যেশ করতে বসে আছি কবে 'পথের পাঁচালী' বেরোবে। 'পথের পাঁচালী'র স্ক্রিপ্ট রিকনস্ট্রা* করতে গিয়েকী পরিমাণ কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল তার ইতিহাস নির্মাল্যবাবু দিয়েছেন উপরোক্ত লেখাটিতে। পুণা ফিল্ম ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক সতীশ বাহাদুর ছাত্রদের পড়ানোর জন্য একটি কাজ চালানো গোছের চিত্রনাট্য তৈরি করে নিয়েছিলেন, তার থেকে ড. পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলায় অনুবাদ করেন, তার উপর সত্যজিৎ স্মৃতি থেকে সংলাপ বসান, সন্দীপ রায় মুভিওলায় একটি স্ক্রিপ্ট চালিয়ে বারবার দেখে ছবির সঙ্গে মেলান। তবু নাকি ছবির সঙ্গে তার কিছু অসংগতি থেকে গেছিল।

পূর্ণাঙ্গ চিত্রনাট্যের বদলে পরিবর্তমান একটি চিত্রনাট্য নিয়ে কাজ করার কারণ দুটো। এক. চিত্রনাট্য রচনা ক্ষমতা সম্পর্কেনিজের সংশয়। দুই, পথের পাঁচালীকে চিত্রনাট্যের আদলে আনা যে -কোনও পোক্ত চিত্রনাট্যকারের পক্ষেও দুরূহ কাজ। উপন্যাসটির গড়ন আক্ষরিক অর্থে পাঁচালীর মতো এলানো এবং শিথিল। কিছুটা যেন ডায়রির মতো এক একটি পাতার উপরে তারিখ দেয়ারবদলে বিভিন্ন পরিচ্ছেদের শুরুতে লেখা আছে 'দিনকতক পরে' (তৃতীয় পরিচ্ছেদ), 'খোকা প্রায় দশমাসের হইল' (চতুর্থ পরিচ্ছেদ),'ইন্দির ঠাক্রুণের মৃত্যুর পর চার পাঁচ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে' (সপ্তম পরিচ্ছেদ), 'কয়েক মাস কাটিয়া গিয়াছে' (দশম পরিচ্ছেদ)। ডায়ারি যেমন যে কোনও জায়গা থেকে পড়া শুরু করা যায়, পথের পাঁচালীও তেমনি যে কোনও জায়গা থেকে শুরু করে অনায়াসেতার ভেতর ঢুকে পড়া যায়। বিভূতিভূষণের পথ-চলা যেন অনন্ত এবং যে কোনও বাঁক থেকে যে কেউ তাঁর সঙ্গী হতে পরে। কিন্তু একজন চলচ্চিত্রকার কী করে এই ট্রানজিশনগুলো টপকাবেন? খণ্ড খণ্ড দৃশ্যগুলো অবশ্যই সত্যজিতের ভাবা ছিল, কিন্তু ট্র্যানজিশনগুলো আমার ধারণা এডিটিং টেবিলে করা। ফলে ছবিটি কেমন লাফিয়ে লাফিয়ে চলে। প্রথম দৃশ্যে সর্বজয়া যখন জল তুলছে আমরা ইঙ্গিত পাই সে অন্তঃসত্ত্বা। কিন্তু সন্তানধারণের কোন্য শারীরিক লক্ষণ তার মধ্যে নেই। বাড়ি ফিরে ইন্দিরের সঙ্গে সর্বজ য়ার ঝগড়া। ইন্দিরের গৃহত্যাগ। পরের দৃশ্যে দেখা যায় রাত। হরিহর পায়চারি করছে। হরিহরের মতো গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রের এই ভাবে দুম করে ইনট্রোডাকশন হয়। অপু জন্মায়। দুর্গা মহানন্দে ইন্দিরকে ফিরিয়ে আনে। ইন্দির অপুর মুখ দেখে। তারপরই পাঁচমাসের ঘুমন্ত অপুকে ইন্দির দোল খাওয়াচ্ছে। অন্যদিকে সর্বজয়া হরিহরের কথা হচ্ছে অন্নপ্রাশন করা নিয়ে। তারপর একদম ছ-বছর বাদে অপুর হঠাৎ এগিয়ে চলাকে সামলাতে গিয়ে এ-ছবিতে তিপ্পান্নটি ডিসলভ এবং বারোটি ফেড ইন ফেড আউট ব্যবহৃত হয়েছে। এডিটিং টেবিলে ছবি সাজাতে গেলে এছাড়া রাস্তা থাকে না।

তবু বলতে হবে বই থেকে ছবি রূপান্তরের ক্ষেত্রে দুটি দিকে তিনি অসাধ্য সাধন করেছেন। এক হচ্ছে বইটি সংক্ষিপ্তকরণের কাজ। এ ব্যাপারে আরেক জনের অবদান থেকে গেছে। পথের পাঁচালী উপন্যাসের তিনটি অংশ 'বল্লালী বালাই', 'আম- আঁটির ভেঁপু' এবং 'অক্রুর সংবাদ'। ১৯৪৪ সালে দিলীপকুমার গুপ্ত ঠিক করেন কিশোরদের জন্য একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ করবেন। এসই উদ্দেশ্যে 'আম আঁটির ভেঁপু' অংশটিকে তিনি আরও এডিট করে নেন। সত্যজিৎ এই সংস্করণের জন্য ছবি এঁকেছিলেন।

'মূলত 'পথের পাঁচালী' পড়বার পর আমি তার সংক্ষিপ্ত সংস্করণটিও পড়ে ফেলি। পড়ে বুঝতে পারি যে, সংক্ষেপণের কাজটা অতি সুন্দরভাবে করা হয়েছে। তিনশো পৃষ্ঠার বইকে নামিয়ে আনা হয়েছে একশো পৃষ্ঠায়। অথচ যেগুলি প্রধান চরিত্র তার একটিও বাদ পড়েনি, প্রধান প্রধান ঘটনাগুলোরও সবই আছে।' (অপুর পাঁচালী-২ সত্যজিৎ রায়)

'পথের পাঁচালী'কে যে ছোট করা যায় এই সাহসটা সত্যজিৎ ডি.কে.র. থেকে পেয়েছিলেন তা আগে উদ্ধৃত সত্যজিতের উক্তি থেকে বোঝা যায '...ডি.কে.র করা সারাংশ আর চিত্রনাট্যের মূল উপাদানের মধ্যে সাযুজ্যও ছিল কম নয়।' আবার সত্যজিৎ তার উপরেত্ত যুক্তিযুক্ত কারিকুরি করেছেন। 'আম আঁটির ভেঁপু' শুরু হয় ইন্দিরের মৃত্যুর পর। সত্যজিৎ সেটা হতে দেননি। তিনি ইন্দিরের মৃত্যুকে পিছিয়ে দিয়েছেন। তবে নিশ্চিন্দিপুর ছেড়ে চলে যাওয়ার দৃশ্যে যে 'পথের পাঁচালী' শেষ হওয়া উচিত এ - ব্যাপারে সত্যজিৎ ও ডি.কে-র ভাবনায় পুরোপুরি মিল ছিল। 'পথের পাঁচালী' ছবি হওয়ার পেছনে এই মানুষটির অবদান কতটা সে ইতিহাস আর বোধহয় পাওয়া সম্ভব নয়। তিনিই সত্যজিৎকে প্রথম পথের পাঁচালী পড়ান

'সিগনেটের স্বত্বাধিকারী ও আমার বিজ্ঞাপনের আপিসের সহকারী ম্যানেজার দিলীপকুমার গুপ্ত অপু - কাহিনীর এই প্রথম পর্বের চলচ্চিত্র সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতন করেন। দিলীপ গুপ্ত ওরফে ডি কে. ছিলেন ফিল্ম পাগল মানুষ। পথের পাঁচালী ছবি হলে তাতে কী থাকবে না থাকবে, কে কোন ভূমিকায় অভিনয় করতে পারে, এমন কি কতগুলো বিশেষ দৃশ্য কীভাবে তোলা হবে সে সম্বন্ধেও ডি.কে.র ভাবনার অন্ত ছিল না। বলা বাহুল্য, আমি পথের পাঁচালী ছবির করার সিদ্ধান্ত নেওয়াতে ডি.কে. আমাকে সবিশেষ উৎসাহিত করেন।' (পথের পাঁচালী চিত্রনাট্য প্রসঙ্গে - সত্যজিৎ রায়)

দ্বিতীয় যে অসম্ভব কাজটি সত্যজিৎ করেছিলেন, যা কৃতিত্ব সম্পূর্ণ তাঁরই, উপন্যাসের গড়িয়ে চলা গঠনের উপর তিনি একটা নাটকীয় কাঠামো আরোপ করে দেন।

'উপন্যাসে যেটা সবচেয়ে লক্ষণীয় পথের পাঁচালীর বিশেষত্বই সেখানে, সেটা হল গ্রামজীবনের নিস্তরঙ্গ মন্থর গতির একটা হুবহু প্রতিরূপ। সিনেমায় এ-গতি অচল। সেখানে ছন্দের প্রয়োজন, উত্থান - পতনের প্রয়োজন - যেটা দর্শক অনুভব করতে পারবে। উদাহরণ স্বরূপ পুজোর দৃশ্য আর গ্রামের যাত্রা মিলে যে আনন্দের পরিচ্ছেদ তারপরে প্রথম ট্রেন দেখার উল্লাস, আবার তারপরে ইন্দিরের মৃত্যু...।' (পথের পাঁচালী - চিত্রনাট্য প্রসঙ্গে - সত্যজিৎ রায়)

সত্যজিৎ সারা ছবি জুড়ে এমন কনট্র্যাস্ট তৈরী করতে করতে গেছেন। শ্রীনিবাস ময়রার কৌতুক দৃশ্য, তারপরই দুর্গার মার খাওয়া, চড়ুইভাতির আনন্দ দৃশ্যের সঙ্গে ইনটারকাটে ধুঁকতে থাকা ইন্দিরকে রূঢ়ভাবে সর্বজয়া শেষবারের মতো খেদিয়ে দেয় ইত্যাদি। বই-এর সঙ্গে ছবির মূল পার্থক্য বইটি বহুমুখী, ছবিটি একমুখী, একান্তভাবেই অপু - দুর্গা কেন্দ্রিক। বইটি

পড়তে পড়তে মনেহয় গ্রামজীবনের একটি এনসাইক্লোপিডিয়া, পাতার পর পাতা পড়ে চলেছি আর জানছি পাতালকোঁড়, ওড়কলমি, ভাটকেওড়া, তিত্তিরাজ, সেয়াকুল, বাসকফুল, গন্ধভেদালি, আলকুশি, রাংচিতা ইত্যাদি লতা - গুল্ম ভরা বাংলাকে। হরিচরণ থেকে শুরু করে বর্তমানবাংলা আকাদেমি কি সংসদ লঅভিধান ঘেঁটে দেখেছি কিছু আছে, কিন্তু এতটা বায়োডাইভারসিটির সন্ধান তারাও দিতে পারেননি। বি ভূতিভূষণে ঘটনা আছে, কিন্তু বর্ণনা বেশি। বইটির ব্যাপ্তি অনেক বেশি, তুলনায় ছবিটি অনেক তীব্র ও নাটকীয়। দুর্গার পেয়ারা চুরি ও মুখুজ্যে গিন্নির তারস্বরে গাল পাড়া দিয়ে ঝপ করে ছবিটি শুরু হয় এবং প্রথম থেকেই উচ্চগ্রামে ও দ্রুত লয়ে বাঁধা হয়ে যায়। সত্যজিৎ ঝাড়াই - বাছাই করে ঘটনাটুকু তুলে নিয়েছেন, কারন ছবি ঘটনাবহুল না হলে হয় না। উপন্যাস বহু সময় ধরে পড়া যায় এবং তার অভিঘাত ধীরে ধীরে চারিয়ে গেলে চলে। ফিল্ম মেকার যদি ঘন্টা দুয়েক টান টান দর্শককে বসিয়ে রাখতে না পারেন, দর্শকেরমনের উপর তৎক্ষণাৎ যদি জবরদস্ত ধাক্কা না দিতে পারেন তো কাঙ্ক্ষিত অনুরণন ওঠে না। এ-কাজে সত্যজিতের সাফল্য প্রশ্নাতীত।

কিন্তু তারপরও প্রশ্ন থেকে যায়। 'পথের পাঁচালী'র সাফল্য কী আজীবন তাঁকে সাহিত্য নির্ভর করে রাখল? এক সময়ে সত্যজিৎ ঠাট্টার ছলে বলেছিলেন, এ - দেশে কেউ বলে না ছবি দেখে এলাম, বলে বই দেখে এলাম। অবচেতন মনে সে সিনেমাকে বই ভাবে। দর্শকের আর দোষ কী? বাংলা সিনেমার বাল্য অবস্থায় তারা দেখেছেন 'আঁধারে আলো' (১৯২১), 'বিষবৃক্ষ' (১৯২২), 'মানভঞ্জন' (১৯২৩) ছবি হচ্ছে। ১৯৫৫ সালে বাংলা ছবি নাবালক হওয়ার সময়েও তারা দেখলেন বই থেকেই ছবি হয়। পরবর্তী সময়েও সত্যজিৎ তাঁর সৃষ্টিকর্মের অধিকাংশ বিষয় বই থেকে নিলেন। ফলে ভুলভাল তুলনা চলতেই থাকল এবং যেসব সমালোচনারজবাব দিতে দিতে সত্যজিৎ এক সময়ে ক্লান্ত হয়ে চুপ করে গেলেন। একদম আদিতে সিনেমার আশে পাশে কিছু টেকনিশিয়ান গোছের লোক জুটেছিলেন। এরা স্বভাবত গল্পকার ছিলেন না এবং সাহিত্যের উপর নির্ভর করেছিলেন। পৃথিবী জুড়ে এই ট্রেন্ড দেখা গিয়েছিল। পরে সেটা কনভেনশন হয়ে যায়। যথেষ্ট সংবেদনশীল মনের অধিকারী হয়েও সত্যজিৎ এই কনভেনশন থেকে বেরোতে চাননি। এটা তাঁর সময়ে বিশ্বচলচ্চিত্রের যে-গতিমুখ তার উলটো রাস্তায় হাঁটা। কারণ পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকে আমরা সারা পৃথিবীজুড়ে দেখেছি সাহিত্যের খপ্পর থেকে অনুভূতিপ্রবণ চলচ্চিত্রকাররা বেরিয়ে আসতে চাইছেন এবং নিজস্ফ অভিব্যক্তি খুঁজছেন। ওই ঋত্বিগর শ্রেণীর মানুষগুলি আর সিনেমার অগ্রদূত নন, ভগীরথের ভূমিকায় এসে গেছেন কিছু শিল্পীসুলভ মানুষ। ১৯৬৫ সালে লেখাএকটি প্রবন্ধে ঋত্বিক সঠিক মন্তব্য করেছিলেন)

> If we look around the world, we will see that modern Cinema is largely turn out of original material. Also, that literature is on the decline. Cinema is increasingly becoming aware of its own power to express that which is inexpressible in any other medium. When I consider all this, Bengali cinema presents a gloomy picture indeed. Yet, I find a false sense of superiority an unjustified pride in our cinema. This attitude is eating at the very roots of the cinema in Bengal. (Bengali Cinema Literary Influence – Ritwik Ghatak চিত্রবীক্ষণ ঋত্বিক সংখ্যা, ১৯৭৬)

অথচ সত্যজিতের নিজেরও গল্প বলার ক্ষমতা ছিল। তিনি অসাধারণ কিছু গল্প লিখেছেন। যে - অতিপ্রাকৃত জগতটা তিনি ছবিতে ধরতে পারেননি সেটা ছোট গল্পে ধরতে চেয়েছেন। পাশাপাশি কিছু চমকে দেওয়ার মতো বাস্তবধর্মী গল্প লিখেছেন- 'অটলবাবু ফিল্মস্টার', 'শিবু আর রাক্ষসের কথা', 'ফটিকচাঁদ'। নিজের গল্প নিয়ে 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' ও 'পিকু'র মতো ছবি করেছেন। তা যথেষ্ট অন্তর্ভেদী কিন্তু উচ্চ মধ্যবিত্তের পরিধিতে সীমাবদ্ধ। বৈচিত্র্যের সন্ধানে এবং যে জগৎগুলো জানা ছিল না তার সন্ধানে তাঁকে সাহিত্যের দিকে হাত বাড়াতে হয়েছে। এই প্রক্রিয়াটা 'পথের পাঁচালী' থেকে শুরু হয়েছিল এবং এর ফলে আমরাও ভাবতে শিখেছি সাহিত্য থেকেই ছবি হওয়া উচিত। চারপাশে এখনও তাই কালানুচিত হাহুতাশ শুনি, বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডার এত ঋদ্ধ অথচ বাংলা সিনেমা তার থেকে নিচ্ছে না। সাহিত্যের ফসল যতই উপচে পড়ুক না কেন তার থেকে ভাল ছবি হয় না, হয়নি। উপরন্তু এটাকে অভ্যেস করে ফেললে সাহিত্য যদি কখনও বন্ধ্যা হয়ে যায় তো সিনেমাও বন্ধ্যা হয়ে পড়বে। সমকাল ছেড়ে তাকে বার বার ফিরে যেতেহবে অতীতচারিতায়, যখন সাহিত্যের সুবর্ণযুগ বিরাজ করত। একটা সময়ে এসে সত্যজিৎও অকপটে ব্যাপারটা স্বীকার করেছেন

যত দিন যাচ্ছে ততই আমি অনুভব করতে পারছি আমার নিজের সময়ের এবং বয়সের একজন মানুষ। আমার চারপাশেকী ঘটছে সে সম্পর্কে আমাকেই বক্তব্য রাখতে হবে। আমি তো চোখের সামনে দেখছি কীভাবে মানুষ বেঁচে আছে, নানা শ্রেণীর মানুষ, নানা মূল্যবোধ সম্পর্কেও আমি ওয়াকিবহাল। উনবিংশ শতাব্দীতে ফিরে যাওয়ার কোনও কামনাই আমার নেই...।

ওই সাক্ষাৎকারে অন্যত্র তিনি বলেছেন-

সাধারণত কী হচ্ছে, অর্ধেক সময়ে পরিচালক নিজেই স্ক্রিপ্টের কাজ করছেন। কিন্তু ভাল মৌলিক কাহিনীর ভয়ানক অভাব। যে-কোনও পূজো সংখ্যা পড়ার চেষ্টা করলেই দেখা যাবে কোনও গল্পই শেষ করা যাচ্ছে না। দশ - পনের পাতা পড়ার পরই ছেড়ে দিতে হয়। এত খারাপ। সিনেমা তৈরির উপযোগী গল্পের সত্যি - সত্যিই অভাব রয়েছে।

'শাখা-প্রশাখা' (১৯৯৯) এবং 'আগন্তুক' (১৯৯১) শেষের দুটি ছবি এবং ছবিটি তিনি করতে চেয়েছিলেন 'উত্তরণ' সব কটিরই গল্প সত্যজিৎ নিজে তৈরি করে নিয়েছিলেন। লক্ষণীয়, তাঁর অন্যান্য ছবির তুলনায় শেষের কটি ছবি অনেক ডিরে* এবং ভার্বোস। তিনি ধরতে পেরেছিলেন দর্শকের চাহিদার বিরাট পরিবর্তন এসে গেছে। সেটা মূলত টেলিভিশনের চাপে। পঞ্চাশের দশকে আমরা যেমন বুঝিনি বিশ্বচলচ্চিত্র একটা ঐতিহাসিক বাঁকে এসে দাঁড়িয়েছিল, সাহিত্যের এক্তিয়ার থেকে বেরোতে চাইছিল, আজও বুঝছি না চলচ্চিত্র আরেকটি বাঁকের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। ডিজিটাল টেকনলজির প্রভাবে সে আজ অনেক বেশি ইফে* নির্ভর। এগুলির সিনথেসিস থেকে ভবিষ্যতের চলচ্চিত্র তৈরি হবে। আমরা তার সঙ্গে তাল রাখতে পারব কিনা জানি না। কারণ 'পথের পাঁচালী' এবং সত্যজিতের পরবর্তী সৃজনকর্ম আমাদের চোখ যেমন খুলে দিয়েছে, আবার তেমন আচ্ছন্নও করে রেখেছে। মহীয়ান সাহিত্য ঐতিহ্য ও তার গরীয়ান চলচ্চিত্র-সম্ভাবনা সম্পর্কে আমরা 'false sense of superiority' এবং 'Unjustified pride'-এ ভুগতে শুরু করেছি। এটা আমাদের চলচ্চিত্রবোধের গোড়ায় কুরে কুরে খাচ্ছে। নিবন্ধের শেষে পাঠকের মনে হতে পারে তা-ই যদি হয় তো বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালী এবং সত্যজিৎ-এর 'পথের পাঁচালী'র মিল - গরমিল নিয়ে এত কথা বলে লাভ কী হল? লাভ একটাই। কনভেনশন ছেড়ে বেরোতে হলেও বোঝার চেষ্টা করতে হয় তার প্রকরণ ও গভীরতা। কারণ এই উত্তরাধিকার এবং এই দ্বন্দ্ব নিয়েই আমাদের আগামী দিনগুলোতে এগোতে হবে।